১৪ ডিসেম্বর

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ❑ অঙ্গসজ্জা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ❑ সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয় তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১৪ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

আজ ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ বহু গুণীজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি জাতির সূর্যসন্তান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি। আমি শহিদ পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে সাথে গোটা জাতি মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে চূড়ান্ত বিজয়। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মেধা ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি এবং যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারকে বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে অসামান্য অবদান রাখেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। ২৫ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়েই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। তবে বিজয়ের প্রাক্কালে এ হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ নেয়। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রেখে যাওয়া আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে পারলেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের ত্যাগ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমি প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

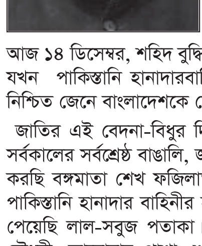

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

আজ ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

জাতির এই বেদনা-বিধুর দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, জাতীয় চার নেতাসহ সকল বীর শহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিতা ২ লক্ষ মা-বোনকে, যাঁদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা। স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াসউদ্দীন, ডা. ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের দোসরদের হাতে শহিদ সকল বুদ্ধিজীবীকে।

বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের পথপরিক্রমায় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম 'স্বাধীনতা'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানরে নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের মুক্তির সংগ্রাম এবং দীর্ঘ ৯ মাসের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বহিনীকে আত্মসর্মপণে বাধ্য করার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

কিন্তু বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তান হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর জামাত, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করে। তারা দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করে। এ হত্যাযজ্ঞের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ যাতে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত মহান স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জনকে অর্থপূর্ণ করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে ধারণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দিন বদলের লক্ষ্যে, অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে। বাংলাদেশকে উন্নত ও আধুনিক 'স্মার্ট' বাংলাদেশ গঠনকল্পে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর রক্তের ও আদর্শের উত্তরাধিকার দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি প্রতিটি বাঙালি ত্যাগ ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে এ প্রচেষ্টায় সামিল হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। তবেই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন হবে বলে আমি মনে করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম.পি

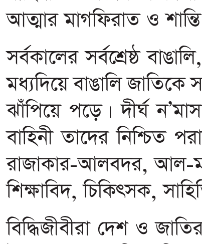

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

আজ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। আমি শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ সকল শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যাঁরা ১৯৭১ সালে বিজয়ের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। তাঁরই আহ্বানে গোটা জাতি মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে চূড়ান্ত বিজয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় জানতে পেরে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর, আল-মামস বাহিনীর সহোযগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, শিল্পীসহ বহু গুণীজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বিদ্ধিজীবীরা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির রুপকার। তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, উদার ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক। জাতির বিবেক হিসেবে খ্যাত আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। ২৫ শে মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়েই বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়। তবে বিজয়ের প্রাক্কালে এ হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রুপ নেয়। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্মম এ হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। বাঙালি জাতি এখনও তার সূর্যসন্তানদের হারানো শোক হৃদয়ে ধারণ করে চলেছে। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রেখে যাওয়া আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী- সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে পারলেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খাজা মিয়া

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি

মুনতাসির মামুন

'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড়ো বড়ো দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা .....'

'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা।....... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর ।....'

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক-যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী একবছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। বধ্যভূমি থেকে প্রায় কেউ ফিরে আসে না, আসে নি। ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি, যেখানে আমাদের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা যাদের প্রধান অংশ ছিল জামাতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকারবাহিনী, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর ও আল-শামস বাহিনী। ৫২ বছর পেরিয়েছে ঐসব নৃশংস ঘটনার। কিন্তু, বাংলাদেশ যেন এসব মনে রাখে নি।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না, তা সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। আমার সামনে ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ কিছু সংখ্যা। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং একসময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়ত, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু, স্বাভাবিক নয়, খুনিদের বিচার না-হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

১৪ ডিসেম্বর কেন আলাদাভাবে বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় তা নিয়েও যে গোড়া থেকেই প্রশ্ন ওঠে নি তা নয়। উঠেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে তারই একটি অংশ বুদ্ধিজীবী হত্যা। পার্থক্য শুধু একটি থাকতে পারে। তা হলো, সাধারণ মানুষদের যত্রতত্র বধ করা হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের খবর নিয়ে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। দুটো প্রক্রিয়াই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তবে ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আরও জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরিকল্পিত উপায়ে তাদের তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের একটি বড়ো অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। 'বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলি, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।'

পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারে নি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণির প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ষাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলো সত্যি যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকের চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানিরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, একধরনের বিশেষ ক্রোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হলো, যদি বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কোষগ্রন্থ'-এ যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত- 'এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নির্বীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেওয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।'

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমাদের অনেকের ধারণা ডিসেম্বরেই বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল। আসলে তা নয়। ২৫ মার্চ থেকেই তা শুরু হয়েছিল। এর প্রমাণ, ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করা। সারা বছর ধরেই এ অপহরণ ও হত্যা চলেছে। আল-বদর, আল-শামস গঠিত হবার পর এ হত্যাকাণ্ড জোরদার হয়ে ওঠে মাত্র। সংকলিত সংবাদে দেখা যাবে, অনেকে ডিসেম্বরের আগেই অপহৃত হয়েছেন কিন্তু তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগী আল-বদর ও আল-শামসরা কতজন বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে? এর সঠিক হিসেব কিন্তু এখনো পাওয়া যায় নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি। কিন্তু কারা শহিদ হলেন, খুনি কারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয় নি। এখনো সে চেষ্টা নেয়া হয় নি। এসব যখন মনে হয় তখন আমাদের পুরো শ্রেণিটির প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে, আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং তারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে-কাজটি করা হয় তাহলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক বাংলায় আবেগময়ী এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল- 'পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আল-বদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংশতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জল্লাদদের বধ্যভূমিতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গলিত বিকৃত সবগুলো মানবীয় বিবেককে প্রতিমুহূর্তে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় রক্তাক্ত করেছে। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবে না।' কিন্তু ক্ষমা করা হয়েছে। এখানে যুদ্ধাপরাধী, আল-বদরদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, এমপি করা হয়েছে। এ জাতি এসবই মেনে নিয়েছে।

এ-সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের একাংশের সহযোগিতার কারণে। এর ফলে দেশে দীর্ঘদিন কায়েম থেকেছে প্রগতিবিরোধী শাসন, থাবা বিস্তৃত হয়েছে মৌলবাদের। প্রায় সময় আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম-প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে অপমানিত বোধ করে নি। তাদের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার জার্মানিতে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করেছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেই প্রথম বৃহৎ আকারে গণহত্যা ও সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। এই প্রজন্মের পরিকল্পক পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং প্রোগ্রাম কার্যকর করার দায়িত্বে ছিল স্থানীয় অবাঙালি ও বাঙালিরা যারা ছিল আল-বদর বা আল-শামসের সঙ্গে যুক্ত।

সামরিক জান্তার পক্ষে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক। এ অনুমান আমাদের তো বটেই, বাইরের অনেকেরও। রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে আমি ফরমান আলীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন তবে একপর্যায়ে স্বীকার করেন ৯ কি ১০ তারিখ তিনি পিলখানা গিয়েছিলেন, এবং সেখানে বেশ কিছু গাড়ি পার্কিং করা অবস্থায় দেখেছিলেন। তার একটি নোটে লেখা আছেড় 'আল-বদরদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা'। তাতে মনে হয় ৯ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত আল-বদরদের বিভিন্ন গ্রুপকে গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা তিনিই করেন এবং আল-বদররা এসব গাড়িতে করে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করে। যাদের অপহরণ করা হয়েছিল তাদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অপহরণ করার জন্য গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সময় যানবাহনের অভাব ছিল। এসব গাড়ি না-পাওয়া গেলে হত্যা-পরিকল্পনা সম্পন্ন করা যেত না। আলতাফ গওহর ইসলামাবাদে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন, কবি সানাউল হকের নাম ছিল তালিকায়। তার এক বন্ধুর মারফত রাও ফরমান আলীকে অনুরোধ করায়, তার ভাষায় 'ফরমান ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে তার নামটি কেটে দেন।'

এ-বিষয়ে ১৯৭১ সালে গঠিত বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। ভারতের সাপ্তাহিক 'নিউ এজ' পত্রিকায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে জানান-

"আল-বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা- পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইয়ের দেহের অবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না।

কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

'আল-বদর বাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছ থেকে সব লেখক ও অধ্যাপকই একরকম ছিলেন। জহীর রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, আল-বদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র।

কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?

'সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুন্ডাদেরকে আল-বদরবাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

'পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়রিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হলো হেইট ও ডুসপিক।

'এদের নামের পাশে ছোটো ছোটো অক্ষরে ইউ.এস.এ. ও ডি.জি.আই.এস. অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে- 'রাজনৈতিক ৬০-৬২, ৭০। অপর এক জায়গায় লেখা আছে- এ দুজন আমেরিকান পি.আই.এ-র একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

'হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি.আই.এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গতবছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

'নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল-বদরবাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

'স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি.আই.এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামাতে ইসলামী দলের নেতারা পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামাতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচার পত্রের ভাষা হলো : বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক দেশ বন্ধু।'

['একাত্তরের ঘাতক দাললরা কে কোথায়' থেকে উদ্ধৃত]

বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদর বাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছে তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও আছে জামাতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ শ ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে ছিল খালেক মজুমদার, 'মওলানা' মান্নান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঈনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোটো আল-বদর ছিল [সংকলন দেখুন]। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। জানার বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয় নি। ১৪-৯-৭১ তারিখে জামাতের মুখপত্র সংগ্রামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল-

"আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আল-বদর সেখানেই । ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।"

আল-বদর ও আল-শামস গঠিত হয়েছিল প্রধানত জামাতে ইসলাম ও ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা। সারাবছর ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালালেও, পরাজয় আসন্ন জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা মরণ-কামড় দেয়। এ-সম্পর্কে সে-সময়কার দৈনিক বাংলায় ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন-

"এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামাতে ইসলামীর আল-বদর। "শহরের কয়েকশ' বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।

'গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমণ্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহুসংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ-পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই । গত একসপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয় নি ।

"ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর এই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত একসপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।"

সমন্বয়ের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের হয়ত এ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না-ও মনে হতে পারে। কারণ তা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে একটি দৈনিকে। সে-জন্য তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)- '...বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডির কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা: যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়।

"শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃত্যুদেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পাড় ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।'

'...এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন : তাদের শরীরের ওপর জমেছে। ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাধের ওপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে : ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গীর্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।"

এর পরের ঘটনা উদ্ধৃত করছি। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালাল কে কোথায়' থেকে- "৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেওয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে যে-সমস্ত তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করেছিল কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক ভারতে নিয়ে চলে যান ।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউজ ঢাকাতেই ছিলেন।

সাক্ষাৎকারে মি. স্টোনহাউজ বলেন, 'বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ-বিষয়ে একটি পদমর্যাদার দশ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মূখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।"

অনেকে বলেন, এত বছর পর আজ, কেনো আমরা হত্যার বিচার দাবি করি। যারা এ কথা বলেন, ধরে নিতে হবে তারা স্বজনহারা হন নি। বাংলাদেশের অগণিত শহিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধী ও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে উগ্র মৌলবাদী আন্দোলন, চলছে তার সমর্থক। যুদ্ধাপরাধী তো বটেই, এদের প্রতিরোধও বাঞ্ছনীয়। এক ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেছেন, যে জাতি তার অতীত ভুলে যায় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কারণ সে তার আত্মপরিচয় হারায় ।

শুধু বুদ্ধিজীবী হত্যা নয়, সামগ্রিক গণহত্যা বিচারের দাবি নির্মূল কমিটি এগিয়ে নিয়ে গেছে। এবং শেখ হাসিনা সরকার বিচার শুরু করেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের ৪৯টি রায়ে মোট ১২৭ জনের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে ৬ জনের। বাঙালির এ প্রাণের দাবি দীর্ঘদিনের পর সফল হয়েছে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত ও কিছু ধর্মীয় দল এ বিচার সমর্থন করেনি। পৃথিবীতে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। পাকিস্তানিরা প্রতিবাদ করেছে। সে জন্য বলি বিএনপি-জামায়াত এখানে পাকিস্তানের রাজনীতি করছে। এ বিচার চলছে তবে তা আরও জোরদার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেকদিন পর হলেও মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নে কাজ করছে। দুই দফায় ৩৯৩ জন গেজেটভুক্ত হয়েছে। আশাকরি তারা কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে এবং আমরা জানতে পারব আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কারা প্রাণ দিয়েছিলেন। ❑

লেখক: শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১৪ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

আজ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। আমি শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ সকল শহিদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশের আপামর জনসাধারণকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় পাকিস্তানের দোসর জামাতসহ ধর্মান্ধ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। তারা রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী গঠন করে পাক হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করার পাশাপাশি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজ করে। বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে তারা দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াসউদ্দিন, ডা. ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ আরও অনেকে। স্বাধীনতা বিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পরাজয়ের জঘন্যতম প্রতিশোধ নেয়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করাই ছিল এ হত্যাযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য।

মহান মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। 'মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তমনা, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ, সংখ্যালঘুদের হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন চালায়। এই সন্ত্রাসী-জঙ্গিগোষ্ঠী ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে দেশব্যাপী আগুন সন্ত্রাস চালায়, মানুষ পুড়িয়ে মারে এবং পরিকল্পিত নাশকতা চালায়। এখনও নানাভাবে তারা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী মানবতাবিরোধী- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে। বিচার চলমান রয়েছে এবং অনেকগুলো বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। এসব রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মা শান্তি পেয়েছে। দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হচ্ছে। এই কুখ্যাত মানবতাবিরোধীদের যারা লালন-পালন ও রক্ষার চেষ্টা করছে, তাদেরও একদিন বিচার হবে, ইনশাআল্লাহ। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ বাঙালি জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমি দলমতনির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে '৭১-এর ঘাতক, মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী, জামাত-মৌলবাদীচক্র এবং গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির যে কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করে দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

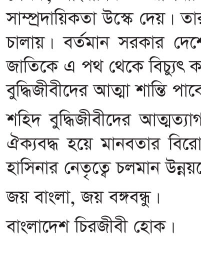

সভাপতি
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আজ ১৪ ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস'। ১৯৭১ সালের এ দিনে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার আল-বদর, আল-শামস সম্মিলিতভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বুদ্ধিজীবীরা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির রুপকার। তাঁরা হচ্ছেন জাতির বিবেক, বুদ্ধিজীবীরা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে সীমাহীন অবদান রাখেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন চক্রান্তের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আল-বদর বাহিনীর সহযোগিতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। মুক্তমনা, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়। দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়। তারা ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়রি জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে দেশব্যাপী আগুন সন্ত্রাস চালায়। বর্তমান সরকার দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে। কোন ষড়যন্ত্রই জাতিকে এ পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে পারে নি। বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। এসব রায় বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মা শান্তি পাবে। দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দলমতনির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবতার বিরোধী যুদ্ধাপরাধী জামাত মৌলবাদী চক্রের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দৃঢ় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এমপি